সার্ধশতবর্ষে রবীন্দ্র প্রাসঙ্গিকতা

সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের জন্মের দেড়শ' বছরে আমরা পৌঁছেছি। পঞ্চাশ বছর আগে তাঁর জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপিত হয়েছিল মহাসমারোহে। শুধু বাঙালি বা ভারতবর্ষে নয়, বহির্বিশ্বে নানা দেশে। তারপর একশ' পঁচিশতম জন্মবর্ষেও স্মরণোৎসব হয়েছে নানাভাবে। শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদিত হয়েছে অসংখ্য স্মারক গ্রন্থে বিচিত্র প্রতিষ্ঠান এবং সাহিত্যসংস্থা থেকে। দেশের বহু পত্রপত্রিকা স্মারকসংখ্যা প্রকাশ করেছে। সভাসমিতি, আলোচনা-চক্র, সংগীত, নৃত্য, নাটক নিয়ে নানা অনুষ্ঠানে যুক্ত হয়েছেন সমগ্র দেশের মানুষ। আর সেই ঢেউ পৌঁছে বিদেশের নানা প্রান্তেও। বিশেষ করে ইংল্যান্ড, জার্মানি, ফ্রান্স, ইটালি, কানাডা, আমেরিকা, চীন, জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়াতে। এইসব দেশেও বেশ কিছু স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ পেয়েছে। কোথাওবা নতুন করে প্রকাশিত হয়েছে রবীন্দ্ররচনা সে দেশের ভাষায়। এ ক্ষেত্রে বোধ হয় বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে জাপান। সেখানে ইংরেজির মাধ্যমে নয়, সরাসরি মূল বাঙলা থেকে অনুবাদ করা হয়েছে জাপানি ভাষায় রবীন্দ্ররচনা—কাব্য, নাটক, গল্প - উপন্যাস, প্রবন্ধ, এমনকি ভাষণ ও চিঠিপত্রও। জাপানের বিখ্যাত প্রকাশন সংস্থা 'দাইসান বুন্মে' রবীন্দ্ররচনা প্রকাশ করেছে দশটি খণ্ডে। আর একাদশ খণ্ডটি রবীন্দ্রসৃষ্টি বিষয়ক নানা প্রবন্ধের সংকলন। লেখক - গোষ্ঠীর মধ্যে আছেন ভারত এবং জাপানের মানুষ।

এই যে উৎসবের আয়োজন, উদ্‌যাপনের আবেগ, এ কি শুধু এক মহান স্রষ্টার অসামান্য কৃতির সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি? নাকি আমাদের ভাবনার মধ্যে এই চেতনাও কাজ করছে যে আমাদের বর্তমান জীবনে রবীন্দ্রনাথ এখনও অনেকখানি প্রাসঙ্গিক, তাঁর চিন্তা ও মনন, তাঁর অনুভব ও উপলব্ধি আমাদের একালীন জীবনেরও পথ চলার মূল্যবান পাথেয় হতে পারে।

রবীন্দ্র-তিরোধানের পর বেশ একটি কাল-খণ্ড পার হয়ে গেছে। আমরা একবিংশ শতকের প্রথম দশকের শেষ সীমায় পৌঁছেছি আজ। বিজ্ঞান এবং কারিগরির বিচিত্র বিকাশে জীবনের চেহারাও বদলে গেছে নানা ভাবে। সেই সঙ্গে নতুন প্রজন্মের ধ্যানধারণাও বদল হচ্ছে ক্রমশ। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠতে পারে এবং উঠছেও যে আজকের দিনে বিশ্বের এই পরিবর্তিত অবস্থায় রবীন্দ্রনাথের প্রাসঙ্গিকতা কোথায় এবং কতটুকু। তিনি কি শুধুই তাঁর কৃতির জন্য স্মরণীয়? নাকি আমাদের বর্তমান জীবনের সংকট ও সমস্যায় পথ নির্দেশক হিসেবে কোনও ভূমিকা আছে তাঁর।

শুধু আমাদের দেশ নয়, সারা বিশ্বেই যে সমস্যাগুলি আজ আমাদের সামনে ভয়ঙ্কর চেহারা নিয়ে দেখা দিয়েছে তার মধ্যে প্রধান একটি হ'ল পরিবেশ সমস্যা। বিশ্বের উষ্ণায়নে নানা চিন্তা নানা পত্রপত্রিকায় লেখলেখিতে চোখে পড়ছে প্রায়ই। বিশ্বের বিজ্ঞানী মহল, বিশেষত পরিবেশবিদেরা বলে চলেছেন তাঁদের উৎকণ্ঠার কথা। তবু আসন্ন, অবশ্যম্ভাবী সংকট সম্পর্কে আমরা যে সম্পূর্ণ সচেতন এবং সমস্যা সমাধানে একটুও অগ্রসর এর কোনও প্রমাণ এখনও মেলেনি। যদিও কঠিন সত্যটি স্বীকার না করে উপায় নেই যে, এই ভাবে চললে আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের জীবন আপদমুক্ত থাকবে না।

১৯১৬ সালে জাপানযাত্রী রবীন্দ্রনাথ সমুদ্রপথে সমুদ্রের জলে ভাসমান বিপুল পরিমাণ তৈলস্তর দেখে উৎকণ্ঠিত হয়েছিলেন। তাঁর সেই তীব্র মানসিক অশান্তি 'জাপানযাত্রী' গ্রন্থে আছে অনেকখানি জায়গা জুড়ে। আমার বালক বয়সে রবীন্দ্রনাথের এই বিরক্তি ও চিত্ত - ক্ষোভকে বুঝে ওঠার ক্ষমতা না থাকায় মনে মনে কৌতুকই বোধ করেছিলাম। ভেবেছিলাম, রবীন্দ্রনাথ সুন্দরের পূজারী কবি, তাই সমুদ্রে ওই ভাসমান তেলের দৃশ্যে তাঁর সৌন্দর্যবোধ আহত হওয়ার এই ক্ষোভ। কিন্তু পরে বুঝেছি, বিশ্বের আসন্ন এক সংকটের পূর্বলক্ষণ উৎকণ্ঠিত করেছিল রবীন্দ্রনাথকে। দূষণ সেই সংকট, যা জলে, স্থলে, আকাশে বিনষ্টির নানা পূর্বাভাষ নিয়ে আজ সামনে সমুপস্থিত। আশ্চর্য, ১৯১৬ সালে যে সমস্যা নিয়ে 'জাপানযাত্রী'রা অনেকগুলি বাক্য ব্যয় করেছেন রবীন্দ্রনাথ, ঠিক সেই সমস্যা নিয়ে 'জাপানযাত্রী'র অনেকগুলি বাক্য ব্যয় করেছেন রবীন্দ্রনাথ, ঠিক সেই সমস্যা নিয়েই অনেক পরে ১৯৮৮ সালে ফ্রান্সে এক প্রখ্যাত ফরাসী নাট্যকার লিখে ফেলেছেন একটি পুরো নাটক। নাটকের সমস্যা সমুদ্রে ভাসমান তেল। তখনও ইংরেজিতে অনুবাদ হয়নি সেই গ্রন্থের, একটি বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল কলকাতা থেকে। বইটির নাম 'জেরেমি কোথায় যাবে?' কলকাতার এক ইংরেজির অধ্যাপক যিনি ফরাসী ভাষায় অভিজ্ঞ, এ অনুবাদ তাঁরই। ভাবতে অবাক লাগে, বিজ্ঞানী বা পরিবেশবিদ নয়, একজন কবি আমাদের দেশের ভাবী বিশ্বসংকটের দুর্লক্ষণে উৎকণ্ঠিত হয়েছিলেন এতখানি! বস্তুত ১৯১৬ সালের বহু আগেই পরিবেশ চিন্তা রবীন্দ্রমনে স্থান পেয়েছিল। এবং বিগত শতাব্দীর একেবারে আরম্ভেই অনেক ইতিবাচক ভঙ্গিতে তার প্রকাশ ঘটেছিল রবীন্দ্রনাথের জীবন ও কর্মে। ১৯০১ সালে পূর্ববঙ্গ - প্রত্যাগত রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজস্ব পরিকল্পনায় এক বিশ্বায়তন গড়ে তুললেন কলকাতা মহানগর থেকে দূরে গ্রাম - বাঙলায়। সেখানে প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলে মুক্ত আকাশের নীচে, গাছের তলায় পাঠদানের ব্যবস্থা করে দিলেন। প্রবর্তন করলেন ঋতু-উৎসবের— বর্ষামঙ্গল, শারদোৎসব, বসন্ত উৎসব ইত্যাদি। লিখলেন নাটক যাকে নাম দেওয়া হয়েছে 'ঋতুনাট্য'। আর রচনা করলেন অজস্র গান— প্রায় দু'হাজার গানের বিপুল সংখ্যার

একটি ভাগ গীতবিতানে 'প্রকৃতি' নামেই চিহ্নিত। প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথের স্বতঃউৎসারিত এই সংগীত পাঠক এবং শ্রোতাদের প্রকৃতিমনস্ক করে তোলে, প্রকৃতি -জীবনকে কাছে এনে দেয়। রাবীন্দ্রিক প্রকৃতি - চিন্তার, পরিবেশ - চিন্তার এ এক আশ্চর্য, ইতিবাচক দিক। আমরা অনেক সময় যথার্থ দৃষ্টিকোণ থেকে মনোযোগী হই না এই বিষয়ে। তাই সৃষ্টির এই সম্ভারকে শুধুই সামাজিক দিক থেকেই বিচার করি, জীবনের, জীবন - সমস্যার, জীবন সংকটের প্রেক্ষিত থেকেও নয়।

আমরা সবাই জানি কবি হলেও রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞান-মনস্ক ছিলেন এবং একজন সাধারণ পাঠক হিসেবে বিজ্ঞানের নানা শাখায় তাঁর সাগ্রহ বিচরণ ছিল। বৃদ্ধ বয়সেও দিবানিদ্রার আশ্রয় গ্রহণ না করে দুপুর আড়াইটে থেকে সাড়ে চারটে পর্যন্ত একটি চেয়ারে বসে শুধুই বিজ্ঞানের বই পড়া তাঁর দৈনন্দিন কর্মের অপরিহার্য অঙ্গ ছিল। এই নিত্যপাঠ্য বিষয়গুলি হ'ল—পদার্থ বিদ্যা, জীবনবিজ্ঞান, যার মধ্যে প্রাণীবিজ্ঞান এবং অবশ্যই পরিবেশ - বিজ্ঞান। এই সব ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের সাম্প্রতিকতম চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত থাকতেন তিনি। এই বিজ্ঞান - চেতনা ছিল বলেই শিলাইদহের গ্রামীণ জীবনে পল্লি উন্নয়নের নানা সফল চেষ্টায় ব্যাপৃত হতে পেরেছিলেন। উত্তরকালে শ্রীনিকেতনে যার আরও সুষ্ঠু প্রকাশ দেখতে পাই। সাম্প্রতিকালে বিজ্ঞানের অবৈজ্ঞানিক ব্যবহার পীড়িত করেছিল রবীন্দ্রনাথকে। জীবনের নানা ক্ষেত্রে ভোগবাদী সমাজের আশু লাভের প্রত্যাশায় প্রকৃতিকে লুণ্ঠন করার অপচেষ্টায়, অদূরদর্শী পরিবেশ দূষণে পীড়িত হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। নাব্যকালের এই অপচেষ্টাগুলি শুধু প্রাকৃতিক পরিবেশকে নষ্ট করে না, মানব সমাজকেও কলুষিত করে, এই মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা তাঁর মর্মপীড়ার কারণ হয়েছিল। তাঁর প্রবন্ধ নিবন্ধে শুধু নয়, শেষ পর্যায়ের নাটকগুলিতে (মুক্তধারা, রক্তকরবী) তার অভিজ্ঞা সকলেরই পরিচিত। এগুলি নব্যকালের বিশ্ব সংকটের সমস্যা নিয়ে লেখা, যার প্রাসঙ্গিকতা সমস্ত আধুনিক বিশ্ব সমাজে।

এই সূত্রেই এসে পড়ে শিক্ষার কথা। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'মানুষের জীবনে যত সমস্যা আছে তার প্রায় সত্তর ভাগ সমস্যার সমাধান শুধুমাত্র শিক্ষা দিয়েই হতে পারে।' শিক্ষাকে কোন দৃষ্টিতে দেখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ এই মন্তব্যেই তার পরিচয় পেয়ে যাই আমরা। শিক্ষা বলতে তিনি বুঝতেন সম্পূর্ণতার শিক্ষা (Education for fullness)। এই শিক্ষা সুস্থ, সংবেদনশীল, সচেতন মন ননয়ে বেঁচে থাকার শিক্ষা— আত্মসর্বস্ব ভোগবাদী জীবনের পরিবর্তে বিশ্বের মানবসমাজ, প্রকৃতিজীবন উভয়ের অন্বয়ে এক সুস্থ, সরল, অথচ যথার্থ জীবনসম্ভোগের বাঞ্ছিত পন্থায় যাত্রী হবার শিক্ষা। সার্ধশতবর্ষের উৎসব যদি সেই পথগামিতার সহায়ক হয় তবেই এই উৎসরে সার্থকতা।

রবীন্দ্রনাথের চিন্তাজগতের অনেকখানি অধিকার করে আছে শিক্ষা। শিক্ষাপ্রসঙ্গ, তার বিচিত্র সমস্যা, সমাধান সূত্র, রবীন্দ্রভাবনার আদর্শশিক্ষা এবং রবীন্দ্র - কর্মজগতে তার বাস্তব রূপদান - চেষ্টা - এ সবই অসামান্য উদ্দীপক প্রসঙ্গ। বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী, যাকে তিনি বলেছেন 'ল্যাবরেটারি', সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ। কেননা বিশ্বভারতী রবীন্দ্র শিক্ষা - চিন্তার প্রত্যক্ষ রূপ। এই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভাবনাকে প্রত্যক্ষ রূপদানের চেষ্টা করেছেন। আর সে রূপ কোনও স্থিরীকৃত, অপরিবর্তনীয় রূপ নয়। তার মধ্যে প্রাথমিকতা আছে, সংযোজন আছে, সংশোধন আছে, পরিবর্তন আছে, এমনকি বৈপ্লবিক পরিবর্তনও। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠান বা রবীন্দ্রনাথের স্বপ্নের বাস্তব মূর্তি বিশ্বভারতী বস্তুত কোনও স্থিরীকৃত অপরিবর্তনীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অনড় মূর্তি নয়। একটু কাব্যিক শোনাবে, কিন্তু এই কথাটা নির্জলা সত্য যে, বিশ্বভারতী রবীন্দ্রনাথের একটি স্বপ্নের মূর্তি, যার অনেকখানি অধরা থেকে যায়। তবে অভিপ্রায়টিই বড়ো কথা। যার রূপায়ণের যাত্রাপথে নানা দিক বদল, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, সাফল্য-বৈফল্য সবই আছে। এবং থাকাটাই স্বাভাবিক। বস্তুত মনে রাখা ভালো —আদর্শ জিনিসটা চির অধরা— তার অভিমুখিতাই মূল্যবান। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী এক আদর্শাভিমুখী যাত্রার নাম।

বিশ্বভারতীর কথায় আসার আগে আসবে এর সূচনা পর্বের কথা। যেখানে এর বীজ। বাইরে সামান্য তার আয়োজন। তার রূপও অতি সামান্য। মহানগর থেকে দূরে পশ্চিমবাঙালার এক অখ্যাত গ্রামাঞ্চলে ছ'টি ছাত্র এবং পাঁচজন অধ্যাপক নিয়ে এর সূচনা। নাম বোলপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়। শান্তিনিকেতন নাম তখন অপরিচিত। কবি রবীন্দ্রনাথের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় যে উৎসাহ তার পিছনে ব্যক্তিজীবনের দুটি অভিজ্ঞতার দান আছে। দুটিই দুঃখজনক এবং তিক্ত অভিজ্ঞতা। বাল্যে রবীন্দ্রনাথের পিতৃদেব পর পর দুটি বিদ্যালয়ে তাঁকে পাঠিয়েছিলেন। সেখান থেকে শিশু রবীন্দ্রনাথ পালিয়ে এসেছিলেন এবং আরও কোনও দিন ওমুখো হননি। ফলে দেবেন্দ্রনাথকে স্বগৃহেই বিদ্যালয়ের আয়োজন করতে হয়েছিল। উত্তরকালে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জীবনস্মৃতি' -তে সেই পর্বের বিবরণ দিয়েছেন 'নানাবিদ্যার আয়োজন' শিরোনামে। যে গৃহবিদ্যালয়ে বাঙলা, সংস্কৃত, ইংরেজি ভাষা, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, সংগীত, চিত্রকলা থেকে শরীর-চর্চা (কুস্তি) পর্যন্ত সবই ছিল। বাইরের ইস্কুল ছেড়ে এই গৃহবিদ্যালয়েই হয়েছিল শিক্ষাক্ষেত্র। কলকাতার বিদ্যালয় দুটির অবাঞ্ছিত পরিবেশ শিশু রবীন্দ্রনাথের মনকে পীড়িত করেছিল এতখানি যে উত্তরকালে এই বিদ্যালয় প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে 'জেলখানা' শব্দটি ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছিলেন। চার দেয়ালে বন্ধ, জীবনবিচ্ছিন্ন হাঁফ-ধরানো পরিবেশ কখনই শিশুমনের উপযোগী নয়, এমনই সিদ্ধান্ত তাঁর।

আর এক তিক্ত অভিজ্ঞতা পূর্ববঙ্গে। পরিণত বয়সে রবীন্দ্রনাথকে যেখানে যেতে হয়েছিল জমিদারি পরিচালনার

কাজে পিতৃদেবেরই নির্দেশে। সেখানে গিয়ে শিক্ষার আলোকবঞ্চিত পল্লিবাসীর শোচনীয়তায় আহত হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বালং এবং মধ্য বয়সের এই দুটি অভিজ্ঞতাই তিক্ত। কিন্তু উত্তরকালে সুফলপ্রসূ। কেউ কেউ বলেন, রবীন্দ্রনাথ ইস্কুল পলাতক, কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাসে নয়, ছেলেবেলায় ইস্কুল পালিয়েছিলেন বলেই উত্তরকালে বন্দী রইলেন ইস্কুলেই আমৃত্যু। সানন্দে স্বেচ্ছাবন্দী।

১৯০১ সালে যখন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা ভাবলেন শিক্ষাবিদ রবীন্দ্রনাথ, তাঁর ধনী এবং শিক্ষিত বন্ধুরা কলকাতাতেই বিদ্যালয় স্থাপনের পরামর্শ দিয়েছিলেন তাঁকে। কলকাতার দক্ষিণাঞ্চলে কিছু জমিও ছিল তাঁর। কিন্তু শহর থেকে দূরে গ্রামীণ পরিবেশে চলে এলেন রবীন্দ্রনাথ, বিদ্যালয় স্থাপন করলেন মূলত কৃষক এবং আদিবাসী অধ্যুষিত অজ পল্লিগ্রামে। এই চলে আসাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ এবং প্রতীকী। ঔপনিবেশিক শিক্ষা মানুষকে শহরমুখী করে তোলে। রবীন্দ্রিক শিক্ষা তাঁর প্রতিবাদ। আমাদের দেশ— রবীন্দ্রনাথের ভাষায় — 'গ্রামে - গাঁথা দেশ'।ন্নের জন্ম গ্রামে, সংস্কৃতির জন্মও তাই। গ্রাম এবং গ্রামীণ মানুষ এ দেশের প্রধান সম্পদ। তাই শিখষার আলো চাই গ্রামে। শুধু আলো নয়, আরো অনেককিছু করণীয় আছে, একথা স্পষ্ট হয়েছে তাঁর কাছে। স্পষ্ট হয়েছে তাঁর উত্তরকালের বিচিত্র কর্মপ্রয়াসে। কীভাবে ব্রহ্মচর্যাশ্রম থেকে ক্রমশ বীজ থেকে মহীরূহের মতো বহুশাখায়িত বিদ্যাচর্চা - কেন্দ্র বিশ্বভারতীর জন্ম একেবারে জৈব বিকাশের মতো, সেকথা সকলেরই জানা। এই যে আয়োজন এ হ'ল সম্পূর্ণতার শিক্ষার আয়োজন (Education for fulness)— 'নানা বিদ্যার আয়োজন' এরই এক ঋদ্ধ রূপ।

পাঠভবন নামে বিদ্যালয়ের সঙ্গে উচ্চতর বিদ্যাচর্চা এবং আন্তর্জাতিক মানের গবেষণা কেন্দ্র 'বিদ্যাভবন', সেই সঙ্গে সঙ্গীত, নৃত্য, নাট্যাদির জন্য সংগীতভবন, চিত্র ও ভাস্কর্য চর্চার জন্য কলাভবন, আর শ্রীনিকেতনে গ্রামীণ শিক্ষার জন্য শিক্ষামন্ত্রক এবং সন্নিহিত গ্রামাঞ্চলের বিচিত্রমুখী সমৃদ্ধি সাধনের জন্য পল্লিসংগঠন বিভাগ (Department of rural reconstruction) এই নিয়ে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীর স্বপ্নের প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তুলেছিলেন এবং কঠিন সাধনায় তার এক প্রানবন্ত মূর্তি নির্মাণ করাও সম্ভব হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী ১৯১৯-এ জন্ম নেয় পরে ১৯২১ -এ আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল এবং প্রখ্যাত ফরাসী ভারতত্ত্ববিদ্ সিলভ্যাঁ লেভির উপস্থিতিতে শান্তিনিকেতনের আম্রকুঞ্জে তার অনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠা ঘটে। বিশ্বের সমস্ত ব্যাখ্যায় বলেছেন, 'Where the East world try to offer its best of the west and receive what best from the west'। সাংস্কৃতি বিনিময়ের পীঠস্থান তাঁর বিদ্যায়তন—প্রাচী ও প্রতীচীর মিলনভূমি। কিন্তু এও শেষ কথা নয়— বিশ্বভারতী 'যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্' — যেখানে সমগ্র বিশ্বের মানুষ একটি ছোট্ট নীড়ে এসে মিলবে। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, রাষ্ট্র নির্বিশেষে মানুষ মানুষের সঙ্গে মিলিত হবে এখানে বিদ্যাচর্চাকে উপলক্ষ করে — বিশ্ববিদ্যালয় হবে বিশ্বমানব মিলন তীর্থ। এই হল রবীন্দ্রনাথের শেষ লক্ষ্য।

আজ এই প্রকৃতিক পরিবেশ দূষণের ভয়ঙ্কর দিনে এবং সেই সঙ্গে বিভেদবিদীর্ণ, যুদ্ধ-আতঙ্ক ভয়াবহ বিশ্বে রবীন্দ্রনাথের স্বপ্ন ও সাধনার জগ! বিশ্বভারতীয় আদর্শটি এতখানি প্রাসঙ্গিক। এখানে আসন পেতেছিলেন রবীন্দ্রনাথ মৈত্রী সাধনার— বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মৈত্রী, বিশ্বমানব সমাজে মৈত্রী, সভ্যতার সঙ্কট মোচনের এ একমাত্র পথ—নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।